জলপদ্য

তসলিমা নাসরিন

অন্য কবিতার বই

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে
আমার কিছু যায় আসে না
অতলে অন্তরীণ
বালিকার গোল্লাছুট
বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা
আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন দেব মেপে
নির্বাসিত নারীর কবিতা

মা বলেছিলেন

বছরের প্রথম দিনে কাঁদিস না,

কাঁদলে সারা বছর কাঁদতে হবে।

মা নেই।

সারা বছর আমি কাঁদলেই কার কী!

অন্যরকম

তুমি এলে, দুঃখ দিয়ে চলে গেলে
বোকা ছেলে!
এ কোনও অচেনা দুঃখ নয় -
এর দাঁতগুলো, নখগুলো কতটা গভীরে যায়
মাংসে, হাঁড়ে, মজ্জায়
হৃদয়ের কোন কুঠুরিতে ঢুকে হল্লা করে, করে না-শুকোনো ঘা
কতটা জল শুষে নিয়ে চর ফেলে

কতটা দিতে পারে বনবাস বা সন্ন্যাস
কী রকম নিখুঁত খেলা খেলে
এ দুঃখ জানি, এ আমার অনেককালের চেনা।

এমন দুঃখ দিয়ে বুঝি স্বস্তি পেলে!
এরকম যে কেউ দিতে পারে, যে কোনও ছেলে,
তুমি অন্যরকম কিছু দুঃখ দিলে না কেন
তুমি তো আর ছিলে না যে কোনও ছেলে!
ছিলে অন্যরকম,
তোমাকে ভালওবেসেছিলাম অন্যরকম।

একটি মৃত্যু, কয়েকটি জীবন

একটি মৃত্যুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি জীবন।

কয়েক মুহূর্ত পর জীবনগুলো চলে গেল
যার যার জীবনের দিকে।

মৃত্যু পড়ে রইল একা, অন্ধকারে
কেঁচো আর কাদায়--

জীবন ওদিকে হিশেব পত্তরে,
বাড়িঘরে,
সংসারে, সঙ্গমে।

তিল পরিমাণ

আমার কাছে তিল ধারণের জায়গা হবে
তালকে যদি ফুঃ মন্তরে তিল করে দাও
জিভখানাকে খসিয়ে তুমি দু'চোখ মেলে দেখতে পারো
এর বেশি আর লোভ ক'রো না।
আমার একটি অন্যরকম জীবন আছে
বড় জোর দরজা অবদি, ভুলেও যেন পা ফেলো না,
সেই জীবনটি যেমন ইচ্ছে যাপন করে গা ছড়িয়ে শোব
প্রয়োজনে শুতেও পারো সংগে তুমি, তিল পরিমাণ তুমি।

শরীর

অনেক তো কথা হল,
চাষের, তাসের, ইতিহাসের, পাশের
বাড়ির ঘাসে হাঁটা দু একটি রাজ হাঁসের!
এবার শরীরের কথা বলি, চল।
ভালবেসে স্পর্শ করি ত্বক, লোমকূপ,
নিবিয়ে সন্ধেবাতি, ধূপ।

শব্দের ঝড়, হৈ রৈ, চিৎকার
ফুরোলে শীৎকার
আর সঙ্গমের জন্য বাকি রাত রাখি তুলে
জীবনের জং ধরা জানলা দরজা খুলে।

চুনোপুঁটির জীবন

নদী থেকে ভেসে ভেসে কোথাকার খালে এসে
অন্ধকারে, সাপখোপের গা ঘেঁসে, ফেঁসে
জড়ালো জালে।

যন্ত্রের জালে
হালে
বা কলি কালে
এমনই দুর্গতি কপালে
এমনই সংসার লুটোপুটির,
জাল থেকে আলগোছে শরীর সরানো যায়
যদি, মন সরে না চুনোপুঁটির।

জলপদ্য

লিখেছি একখানা অনবদ্য জলপদ্য
তুলেছি জল থেকে এক পদ্ম
লালপদ্ম
জলপদ্ম।

কাকে দেব জলপদ্ম, এই পদ্য
যে ছিল নেবার, তার যাবার
তাড়া ছিল তাই চলে গেছে
শীতের পাখির মত গেছে
জলগ্রস্ত নাবিকের মত গেছে।

হাতে পদ্য, জলপদ্ম
অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি বোকার হদ্দ।

গ্রামটির মত

তুমি সেই গ্রামটির মত দেখতে
যে গ্রামের আকাশে আর সূর্য ওঠে না, জমে থাকে
গাদা গাদা কাকতাড়ুয়া মেঘ, চাঁদও লুকিয়ে রাখে পোড়ামুখ।
গাছগুলো বুড়ি বেশ্যার মত ন্যাংটো
কোনও ফুল ফোঁটে না কোথাও
এমনকি বসন্ত এলে একটি গন্ধহীন গাঁদাও না।

ঘরবাড়ি পাথরের মত পড়ে থাকে স্যাঁতসেঁতে ক্ষেতের কিনারে
পাথরগুলো পাহাড়ের চারপাশ ঘিরে
পাহাড়গুলো নদীর দুদিকে
একটি পাখিও ডাকে না কোথাও কেবল রাত ফুঁড়ে খোঁড়া হাওয়ার
কাঁধে ভর রেখে এক তক্ষক ছাড়া

গাভীগুলো জল-চোখে মরা বেড়ালের দিকে,
মানুষের জলহীন চোখ, ভীত
গ্রামটি দেখতে ঠিক তোমার মত, তোমার চোখের মত
যে চোখে তাকালে *কী নেই কী নেই* করে ওঠে বুকের ভেতর।

মৃত্যু যদি আছেই

মৃত্যু যদি আছেই,
যদি বসেই আছে কোথাও ঝোপঝাড়ে ওত পেতে,
দরজার আড়ালে, ছাদে, অন্ধকার গলিতে, চৌরাস্তায়
আসবেই যদি কাছে
তবে আজই কেন নয়!
সন্ধায় যখন বারান্দায় দাঁড়াব একা

কেউ খুঁজবে না,
কেউ ডাকবে না ভেতর ঘর থেকে,
কেউ আসবে না রাখতে একটি হাত কাঁধে
কেউ বলবে না ‘কী চমৎকার চাঁদ উঠেছে দেখ।’

যদি মৃত্যুর হাতে দিতেই হয় যা আছে সব,
তবে আজ নয় কেন!
আজ সে আসুক,
আজই শেষ হোক শূন্যতার সঙ্গে আমার বেহিশেবি সংসার!

মন নেই

এ শহরে টাকা ওড়ে, যে পারে সে ধরে
যাদের জোটেনা, যাদের দায় দেনা
তারাও তক্কে তক্কে থাকে লাখপতি হতে
চতুর্কোণ পাল উড়িয়ে ভেসে জনস্রোতে।

সব আছে, ঘর বাড়ি, গোটা দুই গাড়ি,
বারান্দায় ক্যাকটাস, ফুলের বাগান
পরবে উৎসবে বেসুরো বেতাল নাচ গান,
চৌরাশিয়ার বাঁশি, থেকে থেকে অট্টহাসি।

সবই আছে কেবল মন নেই কোথাও
অতলান্তিক পারি দাও, যে রাস্তায় হাঁটো বা যে বাঁকেই দাঁড়াও।

আত্মহনন

তুমি বলেছিলে ‘*ন মে কিত পা,*
ছেড়ো না আমাকে।
পুরনো চটিজুতোর মত, চিরুনির মত
ঘরের কুকুরের মত,
বেড়ালছানার মত থাকতে দিও কাছে,
তোমার ছায়ার মত।’

অথচ তুমিই ছেড়ে গেলে
আর কারও ছায়া বা ছায়ার ছায়া হতে।

আমি একা বসে স্মৃতির কাঁটা নেড়ে সূক্ষ্ম জাল বুনি
নিজেই জড়াই যে জালে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে-
কে যেন শেকড়সুদ্ধ টেনে ফেলে রাখে খানাখন্দে, ঝোপে
যে ঝোপে পথ ভুলে একটি জোনাকিও আসে না কখনও-
আমার ছায়াটিও বুঝি পালাচ্ছে তোমার মত!

ভালবাসার ভার

ভালবাসা মহানন্দে চেপেছে আমার ঘাড়ে
এত ন্যূব্জ,
কুঁজো,
আমি ভালবাসার ভারে-
ক্ষয় বাড়ে শরীরের হাড়ে।

ইচ্ছে করে পালকের মত
উড়ি,
ঘুরি ফিরি
অনায়াসে ভাঙি কুড়িতলার সিঁড়ি
ছিঁড়ি
সুতো জড়িয়েছি জীবনে যত।

জিগোলো

তুমি তো নেহাত ছিলে এক জিগোলো, প্রেমিক ছিলে না।
প্রেম ভেবে অনর্থক আহ্লাদিত ছিলাম।

শব্দ নয়, মনে হত এক একটি আস্ত গোলাপ ঝরে পড়ছে
চুম্বনে মোমের মত গলে যেত গা।
তুমি এলে এক আকাশ আলো আসত ঝেঁপে
হারানো পাখিরা ফিরত দেবদারু গাছে
শীতের গাছগুলো আচমকা সবুজ হত
তুমি এলে ফুল ফুটত কবেকার মরে যাওয়া বাগানে।

স্বপ্নাতুর রমণীরা হলে এমনই অন্ধ হয়!

প্রেমিক ছিলে না বলে ফিয়েস্তা শেষে বাড়ি চলে গেছ, জিগোলোরা যেমন যায়।
সমুদ্র ভেবে আমি কী ভীষণ ডুবে ছিলাম তোমার দুর্গন্ধ ডোবায়!

বালক বালিকারা

এরা কি দুবেলা খেতে পায়!
ইশকুলে যায়! এই বালক বালিকারা!
এরা নেড়ি কুকুরের আধখাওয়া হাড় কেড়ে খায়
এরা জমে যাওয়া শীতের রাত্তিরে ধুলোকাদায় ঘুমায়
এরা জন্মায়, এই বালক বালিকারা।

যদি বা জন্মায়
বছর বছর মরে খরায় বন্যায়
কেউ কেউ বাঁচে অপেক্ষায় -- এই বালক বালিকারা
এদের জীবন ঘোরে উল্টো চাকায়।

মাঝে মাঝে সন্ধায়
বাবুদের বাড়ির সীমানায়
এরা সুখের দুখের গান গায়
দু'আনা চারআনা চায়।

বাবুরা যায়,
এদের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায়।

তোমার না থাকা

তুমি কি কোথাও আছ
মেঘ বা রঙধনুর আড়ালে!
হু হু বাতাসের পিঠে ভর করে মাঝে মধ্যে আসো, আমাকে ছুঁয়ে যাও!
তুমি কি দেখছ চা জুড়িয়ে জল হচ্ছে আমার
আর আমি তাকিয়ে আছি সামনে যে বাড়ি ঘর, মানুষ, যন্ত্রযান
দুপুরের আগুনে রাস্তা, ঝরে পড়া শুকনো পাতা, মরা ডাল
বুড়ো কুকুরের লালা ঝরা লাল জিভের দিকে
আর তোমার না থাকার দিকে!

তুমি কি খুব গোপনে দেখছ তাকিয়ে থাকতে থাকতে
চোখ কেমন জ্বালা করছে আমার-
তুমি কি কোনও বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কোথাও,
কোনও পাখি বা প্রজাপতি!
কোনও নুড়ি কোনও অচিন দেশে!

মানুষগুলোখাচ্ছেপানকরছেহাঁটছেহাসছে
দৌড়োচ্ছে, জিরোচ্ছে, ভালবাসছে
তোমার না থাকা মাঝখানে বসে আছে, একা।

দু'ইঞ্চি অহং

বড় স্বস্তি বোধ করি সমকামি পুরুষ বন্ধুদের আড্ডায়
ওদের সঙ্গে লুটোপুটি হুটোপুটি, নাচ গান,
মাতাল হওয়া, ন্যাংটো হয়ে গড়িয়ে পড়া মেঝেয় ..
যেমন ইচ্ছে বেসামাল হতে পারি
যেমন ইচ্ছে নষ্ট ভ্রষ্ট।
ঘুমোতে পারি ওদের কোলে, কাখে, বিছানায়--
স্নান শেষে দাঁড়াতে পারি অনিন্দ্য আফ্রোদিতি
বুনো ষাঁড়ের মত তেড়ে আসে না ওরা

যেমন আসে অসমকামি পুরুষ, দু'ইঞ্চি অহং উঁচিয়ে--
যদিও অপটু সাঁতারুগুলো জলে খাবি খেতে খেতে ডোবে।

যদি যেতে চাও

যদি যেতে চাও, এভাবেই যেও--
ঠিক যেভাবে গেছ
ঠিক যেভাবে, আলগোছে, টের না পাই
দরজা আধখোলা রেখে
ফিরে আসবে ভেবে যেন কোনওদিন খিল না দিই।

যেও, যেতেই যদি হয় -- দু চারটে কাপড় ভুল করে
আলনায় ফেলে -- এভাবেই
স্নানঘরে রেখে যেও তোয়ালে
এক জোড়া চপ্পল -- এভাবেই।

দমকা বাতাসও কড়া নাড়ে সময় সময়
কোনও কোনও রাতে এরকমও ভেবে নেব, বুঝি ফিরেছিলে
বেঘোরে ঘুমিয়েছিলাম বলে চলে গেছ।

কপাল

কারও কারও কপালে প্রেম থাকে,
যেমন ইয়োকো ওনো।

প্রেমিক হয়ত দাঁড়িয়ে আছে পথের বাঁকে,
সেও খুঁজছে ঠিক আমার মত কোনও..

দেখা হচ্ছে না এই যা, হলে জীবন হত অন্যরকম,
ওম শান্তি ওম!
এক জীবনে সব হয় না কন্যা,
শরীর জুড়োয় তো, মন না।

বস্তিতে ভগবান এসেছেন

রেললাইনের ওপর বসে আছেন কে! ও কি!
ভগবান নাকি!

ও ভগবান, দেখছেন কী!
ওদের নেভা চুলো! শুকনো সানকি!

মাছি বসে বুড়োদের দুর্গন্ধ ঘাএ
যুবতীরা ভেজা কাপড় শুকোয় গায়ে
বেশরম যুবতীরা, যার তার বিছানায় শোয়! আস্ত খানকি!

দেখুন এক চালার তলে ঘুমোয় কজন!
শরীরের তলে চাপা পড়ে মরছে ওদের মন..
কপাল কুঁচকে ভাবছেন কি!
নরকের নীল নকশা আঁকছেন?

হঠাৎ উঠছেন যে! ও কি ভগবান!
নাকে রুমাল চেপে বড় যে পালাচ্ছেন!

জন্মদিন

মৃত্যুর দিকে আরেক পা এগিয়ে যাওয়া হল, মৃত্যুর দিকে আরেকটি বছর
স্বপ্নের জন্য আরেকটি ঘর তৈরি হল,
আরেকটি বারান্দা।
মৃত্যুর কাছে যাবে বলে জলস্থল বাড়ে জীবনের,
ঘটিবাটি বাড়ে
মমতার দড়িদড়া দৈর্ঘে প্রস্থে বাড়ে
পাওয়ার সুখের চেয়ে হারাবার অসুখ পেতে ভালবাসে মানুষ।

ভালবেসে ফুল দিও আমাকে যে কোনও দিন,

জন্মদিনে নয়।

ওদিন ফুলের গন্ধ পেলে নিজেকে মনে হয় নিজেরই আস্ত একটি কবর।

রাতে

যখন ঘুমিয়ে যায় পৃথিবীর মানুষ.
চাঁদ থেকে নিঃশব্দে নেমে আকাশ-বারান্দায় সে দাঁড়ায়
কিছুক্ষণ উদাসিন হাঁটে
তারপর কী ভেবে মেঘের পাখা পরে নেমে আসে
নিচে, জামা খুলে স্নান করে কাছের পুকুরে
স্নান শেষে ভেজা চুল ভেজাই থাকে,
পাড়ে বসে মিহি গলায় কাকে যেন ডাকে, কে জানে কাকে!

তারপর
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো শিমুলের ডালে ফাঁসিতে ঝোলে সে।
গা থেকে অচেনা ফুলের ঘ্রাণ ভেসে
কিছু কষ্টকাতর মানুষকে রাতভর জাগিয়ে রাখে ..

আমিও জেগে থাকি।

উৎসব

জানলা খুললে মেঘগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরে
ডানায় করে আমাকে তুলে নিয়ে যায় --
পায়ের পাতায় চুমু খায় অরণ্যের জলধোয়া ঠোঁট।
নিতে নিতে অনেক দূরে কোনও এক জলের দেশে..
যে জলে মেঘগুলোকে লাগে ধাবমান ঘোড়ার মত..
আমার রঙিন জামা আকাশের এপার ওপার ছেয়ে থাকে রঙধনু হয়ে।

জলের ওপর মেঘের ত্রিপল তুলে উৎসব হবে আজ--
ঘুঙুর পরে নাচবে একশ গাঙচিল।
জলের দরজা খুললে পুরো আকাশ, আকাশের পিঠে চড়া চাঁদ
হুমড়ি খেয়ে পড়ে জলে..
সারারাত জলে ডুবে গোল্লাছুট খেলে অসংসারি চাঁদ।

কারও সঙ্গে সখ্য হয় না আমার, এমনকি চাঁদের সঙ্গেও
যে কিনা বিনা শর্তে আমাকে খেলতে ডেকেছে।

স্বপ্নের পালক

একটি দোয়েলের পাখায় স্বপ্নের পালক সেঁটে দিয়েছি
আকাশের ঠিকানায় দোয়েল সেটি পৌঁছে দেবে।

আমার স্বপ্নের কথা দোলনচাপা জানে, তাই এত সুগন্ধ ছড়ায় ও।
আমার স্বপ্নের কথা এবার আকাশ জানবে,
জানবে সে,
যাকে ভালবেসে আকাশের একটি ঠিকানা আমিও নেব।

স্বপ্নগুলো আমার এমন কিছু আহামরি কি!
নিতান্তই শাদামাটা। দুঃসহবাস থেকে জন্মের মত ছুটি।

আমার মায়ের গল্প

১.

চোখ হলুদ হচ্ছিল মা'র,
শেষে এমন, যেন আস্ত দুটো ডিমের কুসুম!
পেট এমন তেড়ে ফুলছিল, যেন জেঁকে বসা বিশাল পাথর
নাকি এক পুকুর জল -- বুঝি ফেটে বেরোবে!
মা দাঁড়াতে পারছেন না,
না বসতে,
না নাড়তে হাতের আঙুল,
না কিছু।
মা'কে মা বলে চেনা যাচ্ছিল না, শেষে এমন।
আত্মীয়রা সকাল সন্ধে শুনিয়ে যাচ্ছে
ভাল একটি শুক্রবার দেখে যেন তৈরি হন মা..
যেন *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলতে বলতে
যেন *মুনকার নকির* সওয়াল জবাবের জন্য এলে বিমুখ না হয়
যেন পাক পবিত্র থাকে ঘর দুয়োর, হাতের কাছে থাকে সুরমা আর আতর।

হামুখো অসুখ মা'র শরীরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সেদিন,
গিলে ফেলছে দুফোটা যে শক্তি ছিল শেষের, সেটুকুও।
কোটর থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে চোখ,
চরচর করছে জিভ শুকিয়ে,
ফুসফুসে বাতাস কমে আসছে মা'র,
শ্বাস নেবার জন্য কী অসম্ভব কাতরাচ্ছেন --
যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে কপাল, কালো ভুরু
গোটা বাড়ি তখন চেচিয়ে মা'কে বলছে তাদের সালাম পৌঁছে দিতে নবীজিকে,
কারও কোনও সংশয় নেই যে মা *জান্নাতুল ফিরদাউসে* যাচ্ছেন,
নবীজির হাত ধরে বিকেলে বাগানে হাঁটবেন,
পাখির মাংস আর আঙুরের রস খাবেন দুজন বসে,
অমনই তো স্বপ্ন ছিল, মা'র অমনই স্বপ্ন ছিল।
আশ্চর্য, মা তবু কোথাও এক পা যেতে চাইছিলেন না।
চাইছিলেন বিরুই চালের ভাত রেঁধে খাওয়াতে আমাকে,

টাকি মাছের ভর্তা আর ইলিশ ভাজা। নতুন ওঠা জাম-আলুর ঝোল।
একখানা কচি ডাব পেড়ে দিতে চাইছিলেন দক্ষিণের গাছ থেকে,
চাইছিলেন হাতপাখায় বাতাস করতে চুল সরিয়ে দিতে দিতে -- কপালের কটি এলো চুল।
নতুন চাদর বিছিয়ে দিতে চাইছিলেন বিছানায়,
আর জামা বানিয়ে দিতে, ফুল তোলা..

চাইছিলেন উঠোনে খালি পায়ে হাঁটতে,
হেলে পড়া কামরাঙা গাছটির গায়ে বাঁশের কঞ্চির ঠেস দিতে
চাইছিলেন হাসনুহেনার বাগানে বসে গান গাইতে *ওগো মায়াভরা চাঁদ আর*
মায়াবিনী রাত, আসেনি তো বুঝি আর জীবনে আমার।.. ..

বিষম বাঁচতে চেয়েছিলেন মা।

২.

আমি জানি পরকাল, পুলসেরাত বলে কিছু নেই।
আমি জানি ওসব ধর্মবাদিদের টোপ
ওসব বেহেসত, পাখির মাংস, মদ আর গোলাপি মেয়েমানুষ !

আমি জানি জান্নাতুল ফিরদাউস নামের কোনও বেহেসতে
যাবেন না, কারও সঙ্গে বাগানে হাঁটবেন না মা!
কবর ফুঁড়ে মা'র মাংস খেয়ে যাবে পাড়ার শেয়াল
শাদা হাঁড়গুলো বিচ্ছিরিরকম ছড়িয়ে--
গোরখাদক একদিন তাও তুলে ফেলে দেবে কোথাও,
জন্মের মত মা নিশ্চিহ্ন হবেন।

তবু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে
সাত আসমানের ওপরে অথবা কোথাও
বেহেসত বলে কিছু আছে,
জান্নাতুল ফিরদাউস বলে কিছু,
চমৎকার কিছু,
চোখ ঝলসানো কিছু।
মা তরতর করে পুলসেরাত পার হয়ে গেছেন
পলক ফেলা যায় না দেখলে এমন সুদর্শন, নবীজি,
বেহেসতের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মা'কে আলিঙ্গণ করছেন;
মাখনের মত মা মিশে যাচ্ছেন নবীজির লোমশ বুকে।
ঝরণার পানিতে মা'র স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে
মা'র দৌড়োতে ইচ্ছে ইচ্ছে

বেহেসতের এ মাথা থেকে ও মাথা--
মা স্নান করছেন,
দৌড়োচ্ছেন, লাফাচ্ছেন।
রেকাবি ভরে পাখির মাংস এসে গেছে, মা খাচ্ছেন।
মা'কে দেখতে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা পায়ে হেঁটে
বাগান অবদি এসেছেন।
মা'র খোপায় গুঁজে দিচ্ছেন লাল একটি ফুল,
মা'কে চুমু খাচ্ছেন।
আদরে আহলাদে মা নাচছেন, গাইছেন।

মা ঘুমোতে গেছেন পালকের বিছানায়,
সাতশ *হুর* মা'কে বাতাস করছে,
রূপোর গেলাশ ভরে মা'র জন্য পানি আনছে *গেলবান।*
মা হাসছেন, মা'র সারা শরীর হাসছে
আনন্দে।
পৃথিবীতে এক দুঃসহ জীবন ছিল মা'র, মা'র মনে নেই।

এত ঘোর নাস্তিক আমি,
আমার বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে বেহেসত বলে কিছু আছে কোথাও।

দুঃখবতী মা

মা'র দুঃখগুলোর ওপর গোলাপ-জল ছিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল,
যেন দুঃখগুলো সুগন্ধ পেতে পেতে ঘুমিয়ে পড়ে কোথাও
ঘুমটি ঘরের বারান্দায়, কুয়োর পাড়ে কিম্বা কড়ই তলায়।
সন্ধেবেলায় আলতো করে তুলে বাড়ির ছাদে রেখে এলে
দুঃখগুলো দুঃখ ভুলে চাঁদের সঙ্গে খেলত হয়ত বুড়িছোঁয়া খেলা।

দুঃখরা মা'কে ছেড়ে কলতলা অবদি যায়নি কোনওদিন।
যেন এরা পরম আত্মীয়, খানিকটা আড়াল হলে বিষম একা পড়ে যাবেন মা;
কাদায় পিছলে পড়বেন, বাঘে ভালুকে খাবে, দুষ্ট জ্বিনেরা গাছের মগডালে
বসিয়ে রাখবে মা'কে --

দুঃখগুলো মা’র সঙ্গে নিভৃতে কী সব কথা বলত. . .
কে জানে কী সব কথা

মা’কে দুঃখের হাতে সঁপে বাড়ির মানুষগুলো অসম্ভব স্বস্তি পেত।
দুঃখগুলোকে পিড়ি দিত বসতে,
লেবুর শরবত দিত, বাটায় পান দিত,
দুঃখগুলোর আঙুলের ডগায় চুন লেগে থাকত..
ওভাবেই পাতা বিছানায় দুঃখগুলো দুপুরের দিকে গড়িয়ে নিয়ে
বিকেলেই আবার আড়মোড়া ভেঙে অযুর পানি চাইত,
জায়নামাজও বিছিয়ে দেওয়া হত ঘরের মধ্যিখানে।
দুঃখগুলো মা’র কাছ থেকে একসুতো সরেনি কোনওদিন।

ইচ্ছে ছিল লোহার সিন্দুকে উই আর
তেলাপোকার সঙ্গে তেলাপোকা আর
নেপথলিনের সঙ্গে ওদের পুরে রাখি।
ইচ্ছে ছিল বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে, কেউ জানবে না,
ভাসিয়ে দেব একদিন
কচুরিপানার মত, খড়কুটোর মত, মরা সাপের মত ভাসতে ভাসতে দুঃখরা
চলে যাবে কুচবিহারের দিকে. . .
ইচ্ছে ছিল

দুঃখগুলো মা’র সঙ্গে শেষ অবদি কবর অবদি গেছে,
তুলে নিয়ে কোথাও পুতে রাখব অথবা ছেঁড়া পুঁতির মালার মত ছুঁড়ব রেললাইনে, বাঁশঝাড়ে,
পচা পুকুরে। হল কই!
মা ঘুমিয়ে আছেন, মা’র শিথানের কাছে মা’র দুঃখগুলো আছে,
নিশুত রাতেও জেগে আছে একা একা।

দেশ বলতে এখন

দেশ এখন আমার কাছে আস্ত একটি শ্মশান,
শ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রতিরাতে একটি কুকুর কাঁদে.
আর এক কোণে নেশাগ্রস্ত পড়ে থাকে চিতা জ্বালানোর কজন লোক।
দেশ এখন আমার কাছে আর শস্যের সবুজ ক্ষেত নয়,
স্রোতস্বিনী নদী নয়, রোদে ঝিলমিল দীঘি নয়,
ঘাস নয়, ঘাসফুল নয় . . .

দেশ ছিল মা'র ধনেখালি শাড়ির আঁচল
যে আঁচলে ঘাম মুছে, চোখের জল মুছে দাঁড়িয়ে থাকতেন মা, দরজায়।
দেশ ছিল মা'র গভীর কালো চোখ,
যে চোখ ডানা মেলে উড়ে যেত রোদ্দুরে, রাত্তিরে
যেখানেই ভাসি, ডুবি, পাড় পাই --খুঁজত আমাকে।
দেশ ছিল মা'র এলো চুলের হাতখোঁপা,
ভেঙে পড়ত, হেলে পড়ত, রাজ্যির শরম ঢাকত আমার।

দেশ ছিল মা'র হাতে সর্ষের তেলে মাখা মুড়ি
মেঘলা দিনে ভাজা ইলিশ, ভুনো খিচুড়ি
দেশ ছিল মা'র হাতের ছ'জোড়া রঙিন চুরি।
দেশ ছিল বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে মা মা বলে ডাকার আনন্দ।
কনকনে শীতে মা'র কাঁথার তলে গুটিসুটি শুয়ে পড়া,
ভোরবেলায় শিউলি ছাওয়া মাঠে বসে ঝাল পিঠে খাওয়া. .

অন্ধকারে মুড়ে,
দূরে,
নৈশব্দের তলে মাটি খুঁড়ে
দেশটিকে পুরে,
পালিয়েছে কারা যেন,
দেশ বলে কেউ নেই এখন, কিছু নেই আমার।
খাঁ খাঁ একটি শ্মশান সামনে, একটি কুকুর, আর কজন নেশাগ্রস্ত লোক।

নারী এবং কবিতা

যতটুকু দুঃখ নিয়ে একজন মানুষ নারী হয়ে ওঠে,
ততটুকু দুঃখ নিয়ে সে নারী কবি ওয়ে ওঠে।
একটি শব্দ তৈরি হতে যায় একটি দীর্ঘ যন্ত্রণার বছর,
আর, একটি কবিতা নেয় পুরো এক জীবন।

নারী যেদিন কবি হয়, সেদিন সে পুরো এক নারী
সেদিন সে কষ্টের জঠর থেকে শব্দ প্রসব করার মত পরিণত
সেদিন সে যোগ্য শব্দকে নকশিকাঁথায় ঢাকার।

কবিতার জন্ম দিতে গেলে নারী হতে হয় আগে
যন্ত্রণা ছাড়া যে শব্দ জন্মায় -- ধ্বসে পড়ে স্পর্শমাত্র
আর নারীর চেয়ে যন্ত্রণার নাড়িনক্ষত্র কেই বা জানে বেশি!

পুরুষের কথা বলি

পুরুষের গল্প বলা চাট্টিখানি কথা নয়।
তারাই এ যুগের ঈশ্বর কি না!

ইঁদুরের লেজ ঝুলে থাকে পুরুষের দু'উরুর মাঝখানে..
তা নিয়েই কেশর ফুলিয়ে এদের বনফাটা গর্জন !
যেন লেজের তেজ ঝরাতে চমৎকার দক্ষ একেকজন।

লেজখানা মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠে তা ঠিক,
ফুঁসে ওঠা লেজ বেড়ালের মুখের মত যৌনাঙ্গ দেখে
মুহূর্তে চুপসে যায়, পৌরুষ-ক্ষত থেকে শাদা পুঁজ ঝরে পড়ে টুপটুপ,
খসে যায় বেলুন
(ওয়াক থুঃ!)

আহা.. সঙ্গমের স ও যদি জানত পুরুষ!

তুমি নেই বলে

তুমি নেই বলে ক'টি বিষাক্ত সাপ উঠে এসেছে উঠোনে, ফিরে যাচ্ছে না
জলায় বা জংলায়।

কাপড়ের ভাঁজে, টাকা পয়সার ড্রয়ারে, বালিশের নিচে, গ্লাসে-বাটিতে, ফুলদানিতে,
চৌবাচ্চায়, জলকলের মুখে
ইঁদুর আর তেলাপোকার বিশাল সংসার এখন,
তোমার সবকটি কবিতার বইএ এখন উঁই।
তুমি নেই বলে মাধবীলতাও আর ফোঁটে না
দেয়াল ঘেঁসে যে রজনীগন্ধার গাছ ছিল, কামিনীর,
ওরা মরে গেছে, হাসনুহানাও
গোলাপ বাগানে গোলাপের বদলে শুধু কাঁটা আর পোকা খাওয়া পাতা।

বুড়ো জাম গাছের গায়ে বিচ্ছুদের বাসা, পেয়ারা গাছটি হঠাৎ একদিন
ঝড় নেই বাতাস নেই গুড়িসুদ্ধ উপড়ে পড়ল।
মিষ্টি আমের গাছে একটি আমও আর ধরে না, নারকেল গাছে
না একখানা নারকেল।
সুপুরি গাছেদের নাচের ইশকুল বন্ধ এখন।

তুমি নেই বলে সবজির বাগান পঙ্গপাল এসে খেয়ে গেছে
সবুজ মাঠটি ভরে গেছে খড়ে, আগাছায়।
তুমি নেই বলে মানুষগুলো এখন ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারে যে কাউকে।

তুমি নেই
তোমার না থাকা জুড়ে দাপট এখন অদ্ভুত অসুস্থতার,
আমার শ্বাসরোধ করে আনে দুষিত বাতাস..
আমিও তোমার মত যে কোনও সময় *নেই* হয়ে যেতে চাই।

(তোমার না থাকার দৈত্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘাড়ে,

তোমার না থাকার শকুন ছিঁড়ে খাচ্ছে আমার সর্বাঙ্গ,
তোমার না থাকার উন্মত্ত আগুন পুড়িয়ে ছাই করছে
তোমার না থাকার সর্বগ্রাসী জল আমাকে ডুবিয়ে নিচ্ছে...)

সাত আকাশ

দেখেছিলাম এক আকাশচারির মুখ।
আমাকে সে উড়িয়েছিল এক আকাশ দু'আকাশ করে
সাত আকাশে, দিয়েছিল শীর্ষসুখ!

সুখে আমি ভাসছিলাম, কাঁপছিল শরীর থিরথির!

নক্ষত্রের মত সে চুমু খেয়েছিল প্রতিটি লোমকূপ
নেমেছিল চুপ চুপ..
বিষম জোয়ার-জলে, সাঁতরেছিল সারারাত--
আহা! ছুঁড়ছিলাম সুখে দু'হাত।

আকাশচারি হঠাৎ হারিয়ে গেলে ভিড়ে

পেছনে দেখেনি ফিরে
কী করে পড়ছি আমি নিচে
মাটিতে, ধুলোর রাস্তায়, পিচে।

স্বপ্নের সেই আকাশ
যেখানে আকাশচারির বাস,
আর কেউ যেতে চায় যাক,
পালে যার হাওয়া আছে, নিজেকে হারাক।

ধুলোর ঠিকানা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না

সেন নদীর পারে

সেনের ঠান্ডা জলে ভাসছে জোনের শরীর পোড়া ছাই
আর তার পাড় ঘেঁসে হাঁটছে পুরুষ-পোশাক পরা জোনের মত দেখতে মেয়েরা।
এরা রোববার সকালে নতরদামের ঘন্টা যখন একা একা বাজে
একশ লোক দেখিয়ে প্রেমিকের ঠোঁটে চুমু খায়--
(এরা কি জোনের ছাই জল ছেঁকে তুলে চুমু খায় কখনও!)

শরীর পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে ইতিহাস হাঁসের মত ভেসে যায় জলে
আর সেনের বাতাসে জোনের মত দেখতে মেয়েদের হৃদয় পোড়া গন্ধ

পুরোহিত কিংবা প্রেমিক -- সবই তো আসলে পুরুষের জাত।

দুঃখপোষা মেয়ে

কান্না রেখে একটুখানি বস
দুঃখ-ঝোলা একেক করে খোল..
দেখাও তোমার গোপন ক্ষতগুলো
এ কদিনে গভীর কত হল।

ও মেয়ে শুনছ !

বাইরে খানিক মেলে দাও তো এসব
দুঃখ তোমার একদম গেছে ভিজে..
হাওয়ার একটি গুণ চমৎকার
কিছু দুঃখ উড়িয়ে নেয় নিজে।

ও কি গুনছ!

দিন!

দিন তো যাবেই! দুঃখপোষা মেয়ে!
শুকোতে দাও স্যাঁতসেঁতে এ জীবন
রোদের পিঠে, আলোর বিষম বন্যা
হচ্ছে দেখ, নাচছে ঘন বন..

সঙ্গে সুখী হরিণ।

ও মেয়ে হাসো,
নিজের দিকে দু'চোখ দাও, নিজেকে ভালবাসো।

নারী

ওক গাছ তো নয়, আস্ত এক শিশ্ন--
মেঘেরা তার বীর্য, শিশ্ন থেকে বীর্য উড়ে গেছে--
হুম ঠ্যালা সামলা কৃষ্ণ

বীর্য যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে, উতল হাওয়া বয়
নারীগুলোন গর্ভবতী হয়।

ও কি পাহাড়-জোড়া! নাকি নিতম্ব!
নারী ওতে জন্ম দিতে গেছে
ঘাস অথবা জল, জল অথবা ভেড়া..
ডিঙিয়ে গেছে সাধসাধ্যের বেড়া!

শিশ্ন উত্থিতই থাকে, ঝড়ে পড়লে গুড়িসুদ্ধ ধপাস।
মাটি থাকে স্থবির শুয়ে, নারী ফলায় যা ফলানোর-

সারাদিনের ঘানি

টানার পর শস্য এবং প্রাণী।

হস্তমৈথুন

(পুরুষ ছাড়া নারী, সাইকেল ছাড়া মাছ)

পুরুষ ছাড়া গতি নেই নারীর!
হা হা! যুক্তি ভুতের বাড়ির।
ছুঁড়ে দাও ওসব ছেদো কথা!
জড়িও না আগাছা গুল্মলতা
খামোকা ওই নিখুঁত শরীরে।
কেন যাবে বিষ পিঁপড়ের ভিড়ে!

তোমার হাতে আছে তীর, তোমার হাতে তূণ
কর হস্তমৈথুন।

তুমি

বেড়ালেরা ঝগড়া করলে ভাবি শিশু কাঁদছে!
হেলিকপ্টার উড়ছে আর ভেবে বসি জলের কিনারে ডানা ঝাঁপটাচ্ছে একঝাঁক হাঁস।
ক্রিসমাসের শহর দেখে ভাবি জোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব।
তুমি কাছে এলে মনে হয় অন্য কেউ এল
হাসো যখন, ভাবি বিষম কাঁদছ বুঝি।

আমার সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যায় আজকাল।
কিছুই মানাচ্ছে না আমাকে
বাগানবাড়ি
পর্স গাড়ি
গুচি
ভারসাচি

কেবলটিভি
ডিভিডি

গোয়ার্তুমি
তুমি।

টুকরো গল্প

১. দু'শ টাকা দেবে এই শর্তে পুরুষ চাইল একটি নয়, দুটি কিশোরী। কিশোরীরা রাজি হল। ঘরে ঢুকেই পুরুষ আদেশ করল এক কিশোরীর পায়ের বুড়ো আঙুল আরেক কিশোরীকে চুষতে। তাই করল তারা। আঙুল চুষছে তো চুষছেই, পুরুষ দেখছে তো দেখছেই। চোষা থেকে মুখ ওঠালেই বলছে -- থামলি যে!

২. ছেলের আবদার মেয়েকে খাবে, চাবকাবে। চাবুকে কাবু হল মেয়ে আর যৌনানন্দ কুড়িয়ে কুড়ি টাকা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল ছেলে।

৩. নারীকে শিকলে বেঁধে চারপায়ে হাঁটাল পুরুষ--কুকুরকে যেমন হাঁটায় কুকুরের বাপেরা।

৪. যৌনাঙ্গ বড় ঢিলে, সরুপথ ভ্রমণে সুখ হয় বেশ-- পুরুষ তাই নারীকে উপুড় করে কলসে ঢোকালো কলা।

৫. হেগে দিয়ে নারীর মুখে বুকে পেটে বলল সে চেটে খা। নারী চেটে খাচ্ছে, দেখে খেটে খাওয়া পুরুষের হৃদয় জুড়োল।

৬. নারীর বাহুতে, নিতম্বে আগুনজ্বলা সিগারেট নেভাচ্ছে পুরুষ। একটির পর একটি। পুরুষের ভাল লাগে ত্বক পোড়ার শব্দ। চুলের কাছে ম্যাচকাঠি নিলে চিরচির করে চুল পোড়ে, শব্দ তো নয় যেন সঙ্গীত। সমঝদার পুরুষ হাত পা ছুঁড়ে হাসছে।

৭. মেয়েটিকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল সে। মরে যেতে থাকা মানুষটির জিভ বেরিয়ে আসছে, চোখ বিস্ফারিত হচ্ছে দেখে পুরুষাঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, উত্তেজনায় কাঁপছে পুরুষ।

বয়স

একটি করে দিন যায় আর বয়স বাড়ে
একটি করে রাত আসে আর বয়স বাড়ে।
গ্রীস্ম গিয়ে বর্ষা আসে, বয়স বাড়ে
শীতের শেষে বসন্তের ফুল ফোটে আর বয়স বাড়ে।

অসুখ যায় অসুখ সারে
কোনও এক মাঝদুপুরে অলক্ষে অসুখ বাঁধে হাড়ে।
হাড়ের ভেতর বয়স বাড়ে
ধা ধা করে বয়স বাড়ে,
আর নিশুত রাতে বুকের কোঠায় কে যেন খুব দরজাখানা বিষম জোরে নাড়ে,
হুড়মুড়িয়ে দস্যু ঢুকে নিঃশ্বাসের বাতাসটুকু কাড়ে।

ফেরা

মা একদিন ফিরে আসবেন বলে
মা'র ঘটিবাটি, দু'জোড়া চটি
বিছানার চাদর, লেপ কাঁথা,
ডালের ঘুঁটনি, হাতা
ক'টি কাপড়, ক'টি চুরি দুল
চিরুনিখানি, ওতে আটকা চুল
ফুল ফলের ছবি, মা'র আঁকা
যেখানে যা কিছু ছিল, তেমন করেই রাখা।

মা ফিরে আসবেন
ফিরে কলতলায় পায়ের কাদা ধুতে ধুতে বলবেন
খুব দূরে এক অরণ্যে গিয়েছিলাম!
তোরা সব ভাল ছিলি তো!
খাসনি বুঝি! আহা, মুখটা কেন শুকনো লাগছে এত!
বাঘ ভালুকের গল্প শোনাতে শোনাতে মা আমাদের খাওয়াবেন রাতে
অনেকদিন পর মাও খাবেন মাছের ঝোল মেখে ভাতে,
খেয়ে, নেপথলিনের গন্ধঅলা লালপাড় শাড়ি পরে একটি তবক দেওয়া পান
হেসে, আগের মত গাইবেন সেই চাঁদের দেশের গান।

একদিন ফিরে আসবেন মা
ফিরে আসবেন বলে আমি ঘর ছেড়ে দু'পা কোথাও বেরোই না
জানালায় এসে বসে দু'একটি পাখি,
ওরাও জানে মা ফিরবেন, বিকেলের দুঃখী হাওয়াও,
আকাশের সবকটা নক্ষত্র জানে, আমি জানি।

আছে মানুষ, নেই মানুষ

এখানে যারা ছিল তারা নেই আর
যারা আছে তারাও থাকবে না
তুমি না,
আমি না।

আমাদের ত্বক থেকে গজিয়ে উঠবে ঘাস, চুলের ডগা থেকে মেঘছোঁয়া কৃষ্ণচূড়া
কারো কারো হাড় থেকে সাত তলা দালান
সেসব দালানে বসে জীবনের চারাগাছে জল দেবে যারা,

তারাও একদিন সার হবে আমজামকামরাঙার।

এখানে ছিল এখানে আছে
এখানে নেই সেখানে নেই কোথাও নেই
নেই তো নেই-ই
নেই

যারা নেই হয়ে যায়, তাদের কেউ খোঁজে না কখনও
বেঁচে থাকা মানুষের ব্যস্ততা বিষম, বাঁচার জন্য।

লিঙ্গপূজা

উত্থিত শিশ্নের মত ইফেল টাওয়ার,
উরুদেশে সকালসন্ধা পূজারির ভিড়, কড়ি ঢালছে, চূড়োয় উঠছে,
প্রসাদ খাচ্ছে...

আকাশ লুকিয়ে রেখেছে তার ভেজা মেঘযোনী,
আর লিঙ্গ কেবল লিঙ্গ দেখিয়েই জগত ভোলাচ্ছে।
কখনও সে কালো, কখনও সোনালি, হলুদ..
তা হোক, পূজারিরা এর যে কোনও রঙেই মুগ্ধ।

আমি লিঙ্গে বিশ্বাসী নই,
ভগবানের লিঙ্গকেই পরোয়া করি না, ইফেল কোন ছার!

শূন্যতা

কি যে হচ্ছে! কিছু কি হচ্ছে? কি হচ্ছে কে জানে।
কিছু কি হবে! কী হবে আর! কীই বা হতে পারে।
হলে কী! কি আর! কিছু কি! কী জানি কী।

হচ্ছে না কিছুই।

কিছুই হবে না।

আনা কারেনিনা

প্রতিটি নারীর ভেতর বাস করে একজন আনা কারেনিনা
জানি না নারী তা জানে কি না
সম্ভবত না।

ডাঙা

যাবে কতদূর, কতদূর আর যেতে পারো একা
ভেড়াতেই হবে নাওখানা কোনও এক তীরে,
জলে জন্ম মানুষের নয়,
দলছুট মানুষও একলা নির্জনে
গহন রাতের কোলে ক্লান্ত মাথা রেখে প্রাণপণ চায় আবার মানুষ।

আমি এক অচেনা ডাঙায়
কোঁচড়ের কানাকড়ি দিয়ে-থুয়ে খালি-হাত বসে আছি
চড়া দামে বিক্রি হয় ভালবাসা এ অঞ্চলে।

বিবি খাদিজা

সে এমন সময়, কন্যা জন্মালে পুঁতে ফেলতে হত মাটিতে।
খাদিজা কিন্তু কারও না কারও কন্যা ছিল
তাকে কেউ পুঁতে ফেলেনি, সে বরং চুটিয়ে বাণিজ্য করেছে
টাকার থলে ভারি ছিল বলে তার পায়ের কাছে নত হয়েছে পুরুষ,
এমনকি মহাপুরুষও।

থলে ভারি বলে সে বুড়ি হয়েও তুড়ি বাজিয়ে গেল,
পুরুষের বহুগমন বন্ধ হল আপাতত

দিব্যি প্রেমিকের মত খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুরুষ,
এমন কি মহাপুরুষও।

ধর্মও ধুলোয় গড়ায় কড়ির শব্দ শুনে।

স্বেচ্ছামৃত্যু

জীবনের চেয়ে বেশি এখন মৃত্যুতে বিশ্বাস আমার,
চেনা শহরের চেয়ে দ্বীপান্তরে
প্রেমের চেয়ে বেশি অপ্রেমে।

কেউ আমার, ধরা যাক কোথাও বসে আছি
ঘাসে অথবা ক্যাফেতে অথবা বাসস্টপে
কাছ ঘেঁসলেই মনে হয়
এই বুঝি জীবনের রঙের স্বাদের গন্ধের
কথা শোনাতে এল..
তড়িঘড়ি দৌড়ে যাই নির্জনতার দিকে
জমকালো বিষন্নতায়, শূন্যতার ভিড়ে

জন্ম থেকে এখানেই বাস আমার, এখানেই মানায় আমাকে।

একটি অকবিতা

আমার মা যখন মারা যাচ্ছিলেন, সকালবেলা স্নান করে জামা জুতো পরে ঘরবার হলেন বাবা, চিরকেলে অভ্যেস। বড়দা সকালের নাস্তায় ছ'টি ঘিয়ে ভাঁজা পরাটা নিলেন, সঙ্গে কষানো খাসির মাংস, এ না হলে নাকি জিভে রোচে না তাঁর। ছোড়দা এক মেয়েকে বুকে মুখে হাত বুলিয়ে সাধাসাধি করছিলেন বিছানায় নিতে। সারা গায়ে হলুদ মেখে বসেছিলেন বড়বৌদি, ফর্সা হবেন; গুনগুন করে হিন্দি ছবির গান গাইছিলেন, চাকরবাকরদের বলে দিয়েছেন ইলিশ ভাঁজতে, সঙ্গে ভুনা খিচুড়ি। ভাইয়ের ছেলেগুলো মাঠে ক্রিকেট খেলছিল, ছক্কা মেরে পাড়া ফাটিয়ে হাসছিল। মন ঢেলে সংসার করা বোন আমার স্বামী আর কন্যা নিয়ে বেড়াতে বেরোল শিশুপার্কে। মামারা ইতিউতি তাকিয়ে মা'র বালিশের তলে হাত দিচ্ছিল সোনার চুরি বা পাঁচশ টাকার নোট পেতে। খালি ঘরে টেলিভিশন চলছিল, যেতে আসতে যে কেউ খানিক থেমে দেখে নেয় তিব্বত টুথপেস্ট নয়ত পাকিজা শাড়ির বিজ্ঞাপন। আমি ছাদে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নারীবাদ নিয়ে চমৎকার একটি কবিতা লেখার শক্ত শক্ত শব্দ খুঁজছিলাম।

মা মারা গেলেন।
বাবা ঘরে ফিরে জামাকাপড় ছাড়লেন। বড়দা খেয়ে দেয়ে ঢেঁকুর তুললেন। ছোড়দা রতিকর্ম শেষ করে বিছানা ছেড়ে নামলেন। বড়বৌদি স্নান সেরে মাথায় তোয়ালে পেঁচিয়ে ইলিশ ভাঁজা দিয়ে গোগ্রাসে কিছু খিচুড়ি গিলে মুখ মুছলেন। ভাইয়ের ছেলেগুলো ব্যাট বল হাতে নিয়ে মাঠ ছাড়ল। স্বামী কন্যা নিয়ে বোনটি শিশুপার্ক থেকে ফিরল। মামারা হাত গুটিয়ে রাখলেন। আমি ছাদ থেকে নেমে এলাম। ছোটরা মেঝেয় আসন পেতে বসে গেল, টেলিভিশনে নাটক শুরু হয়েছে। বড়দের এক চোখ মায়ের দিকে, আরেক চোখ টেলিভিশনে। মায়ের দিকে তাকানো চোখটি শুকনো, নাটকের বিয়োগান্তক দৃশ্য দেখে অন্য চোখে জল।

যদি

কাউকে বাঁচতে দেখলে অসম্ভব রাগ হয় আমার।
পৃথিবীর সব গাছ যদি মরে কাঠ হয়ে যেত
পাহাড়গুলো ধ্বসে পড়ত বাড়িঘরের ওপর,
নদী সমুদ্র শুকিয়ে চর হয়ে যেত, সেই চরে
পশুপাখি মানুষ এক বিষম অসুখে কাতরে কাতরে মরে যেত!
কদাকার পিন্ডটি যদি মহাকাশে ছিঁড়ে পড়ত হঠাৎ,
সূর্যের দু'হাত কাছে গিছে ঝলসে যেত, ছাই হয়ে যেত!

এরকম স্বপ্ন নিয়ে আজকাল আমি বেঁচে থাকি
আর এই বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন বিবমিষা, প্রতিদিন ঘৃণা..

ন্যাড়া দশবার বেলতলা যায়

প্রথম টপকে গেলে নিষেধের বেড়া
বারবার টপকায়,
একবার কেন, বেলতলা দশবার যায় ন্যাড়া।

ন্যাড়ার মাথায় বেল তো বেল, আকাশ ভাঙুক ক্ষতি নেই!
যে পথে ইচ্ছে, অলিগলি ঘুরে সে পথেই যাবে ন্যাড়া,
ন্যাড়া কি তোমার ভেড়া!

ন্যাড়ার ঘাড়ের দুটো রগ বড় ত্যাড়া।

ধোঁয়া

ধোঁয়ায় উড়ছে ঘর, কবিতার হারানো অক্ষর,
উড়ছে আমার শিশুকাল আর ধুসর যৌবন
যা ছিল লুকোনো ঝাঁড়ে জঙ্গলে যক্ষের ধন,
উড়ছে নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে বেহায়া ঈশ্বর।

দেয়ালে টাঙানো মা'র হাসিমুখ
ভেতরে লুকিয়ে হামুখো অসুখ,
হতচ্ছাড়া আমি বেঁচে আছি বেদনায়-
ঈশ্বরের লেজ ধরে ঝুলছি ধোঁয়ায়।

মা কষ্ট পেলে আমাদের কিছু যায় আসত না

আমার একটি মা ছিল
চমৎকার দেখতে একটি মা,
একটি মা আমার ছিল

মা আমাদের খাওয়াত শোয়াত ঘুম পাড়াত,
গায়ে কোনও ধুলো লাগতে দিত, পিঁপড়ে উঠতে না,
মনে কোনও আঁচড় পড়তে দিত না
মাথায় কোনও চোট পেতে না।
অথচ
মাকে লোকেরা কালো পেঁচি বলত,
আমরাও।
বোকা বুদ্ধু বলে গাল দিতাম মা'কে।

মা কষ্ট পেত।
মা কষ্ট পেলে আমাদের কিছু যায় আসত না।

আমাদের কিছুতে কিছু যায় আসত না,
মা জ্বরে ভুগলেও না,
মা জলে পড়লেও না,
মা না খেয়ে শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেলেও না
পরণের শাড়ি ছিঁড়ে ত্যানা হয়ে গেলেও না,
মা'কে মা বলে মনে হত, মানুষ বলে না।
মা মানে সংসারের ঘানি টানে যে
মা মানে সবচেয়ে ভাল রাঁধে যে, বাড়ে যে,
কাপড় চোপড় ধুয়ে রাখে গুছিয়ে রাখে যে
মা মানে হাড় মাংস কালি করে সকাল সন্ধে খাটে যে
যার খেতে নেই, শুতে নেই, ঘুমোতে নেই
যার হাসতে নেই

যাকে কেবল কাঁদলে মানায়
শোকের নদীতে যার নাক অবদি ডুবে থাকা মানায়
মা মানে যার নিজের কোনও জীবন থাকে না।
মা'দের নিজের কোনও জীবন থাকতে নেই!
মা ব্যাথায় চেঁচাতে থাকেলে বলি
ও কিছু না, খামোকা আহলাদ!
মরে গেলে মাকে পুঁতে রাখে মাটির তলায়,
ভাবি যে বিষম এক কর্তব্য পালন হল

মা নেই।
আমাদের এতেও কিছু যায় আসে না।

দুঃখ দেবে সমুদ্দুর

আমার কাছে দুঃখ আছে রঙ বেরঙের দুঃখ আছে, দুঃখ নেবে দাদা?
ক'কিলো চাই?
ঠকাবো কেন! কী যে বলছ ছাই!
জীবনভর ঠকিয়ে গেছি নিজেকে শুধু, অন্যকে না,
এ খবরটি শহর জুড়ে সবাই জানে, কে না!
তুমি তো দাদা সুখের বিলে ডিঙি ঠেললে, গায়ে মাখলে কাদা,
দুঃখ কেনো, দুঃখ দেবে সমুদ্দুর,
দুঃখ দেবে স্রোতের কাঁধে জীবন রেখে পরান খুলে কাঁদা।

কলকাতা

কলকাতা তেমনই আছে,
ভিখিরির ভিড় আর ধুলো
ফুটপাতে টিমটিমে চুলো,
কড়ায়ে গরম হয় তেল -
গন্ধে, বন্ধে
সন্ধেবেলা বসে নন্দনে আঁতেল।

কলকাতায় কী নেই!
মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে নোংরা গঙ্গা
দুটোকে মাথায় তুলে হারায় সঙঙ্গা।
বারো মাসে তের পুজো, পাগলের কুম্ভমেলা,
চোখে ঠুলি পরে অলক্ষুণে ধর্ম ধর্ম খেলা।

কলকাতা ঠিক সেই,
যেমন বেয়াড়া ছিল, নেশায় হারিয়ে খেই
ভুল ঠিকানায় বাড়ি ফেরে মাতাল কবিরা
অনায়াসে ছুঁড়ে দিয়ে মনি মুক্তা হীরা
কেউ কেউ বেছে নেয় আটপৌরে জীবনের কাঁসা
কলকাতা এমন শহর, যে শহরে প্রাণ খুলে যায় হাসা

কলকাতা এমনও শহর, যাকে অনায়াসে যায় ভালবাসা।

আমার কোনও বন্ধু নেই

আমার কোনও বন্ধু নেই, আপন কিছু শত্রু আছে শুধু
শত্রু নিয়ে পাড়া বেড়াই, শহর ঘুরি নীল গাড়িতে, পাতাল রেলে বাসেও চড়ি, দোকানপাটে,
রাস্তাঘাটে, রেস্তোরাতে ভিড়ে
রাত্তিবেলা ফিরে
যে যার মত গরম জলে স্নান করে নি’,
মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে দুজোড়া ঠোঁটে মুহুর্মুহু চুমু
দুজন বেসে দুজনকেই ভীষণ ভাবে ভাল

এক বালিশে ঘুমিয়ে পড়ি, নিবিয়ে কড়া আলো।

সকালবেলা দুজন উঠে নাস্তা করি, বাজার ঘুরে শাকসবজি মাছ মাংস কিনে
রান্না করি, বাসন মাজি, মিটিয়ে ফেলি দিনের কাজ দিনে।
শত্রু বসে বাঁশি বাজায়, মুগ্ধ চোখে তাকায় চোখে, আমি
দেখে পাগল, হৃদয় জলে জোয়ার ওঠে, সমুদ্দুরে নামি,
সারা দুপুর সাঁতরে ফিরি ডাঙার খোঁজে, কোথায় পাব! তার অতলে থামি।
জেনেই থামি শত্রু সমকামি,
ভেতরে তার বিষ লুকোনো দাঁত, কামড়ে দেবে যখন খুশি
তারই বা দোষ দিচ্ছি কেন!
নিজেই আমি নিজের মনে অসম্ভব এক শত্রু পুষি না কি!

নির্মলেন্দু গুণ

মুখ চুন করে বসে আছেন নির্মলেন্দু গুণ,
এলে ফাল্গুন,
ইচ্ছে তার করেন দুএকটি খুন
লোকে বলে এ গুণের দোষ, আমি বলি গুণ।

গুণ তো দেখছেন, দেশটিকে কুড়ে খাচ্ছে ঘুণ।

সাধ

তোমাকে কখনও বেড়াতে নিইনি

যেখানে চাঁদের নাগাল পেতে পাহাড়ের কাঁখে চড়ে বসে থাকে একটি দুষ্টু নদী, গায়ে হলুদের দিনে একঝাঁক নক্ষত্রের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুপ চুপ, টুপ করে জলে প'ড়ে নদীর সারা গায়ে চুমু খায় চাঁদ!

তোমাকে কি নিয়েছি

যেখানে সমুদ্র মন খারাপ করে বসে থাকে, আর তার জলতুতো পাখিগুলো অরণ্যের বিছানায় শুয়ে রাতভর কাঁদে। সমুদ্রের মন ভাল হলে নেমন্তন্ন করে পাখিদের, অঢেল খাবার আর পানীয়ের ছড়াছড়ি -- পাখিরা বিষম খুশি, কিছু ফেলে, কিছু খায়। নাচে, গায়!

তোমাকে বড় নিতে ইচ্ছে করে

যেখানে বরফের চাঁইএর হাঁটুতে মাথা রেখে সুবোধ বালকের মত ঘুমিয়ে আছে আগ্নেয়গিরি, আর দিগন্তের মাথায় ঠোকর খেয়ে কেঁদে কেটে চোখ লাল করে অভিমানে দৌড়ে বাড়ি ফেরে হাওয়ার কিশোরী, দেখে বরফের চোখেও জল জমে মায়ায়।

তোমাকে কত কোথাও নিতে ইচ্ছে

যেখানে সাতরঙ জামা পরে প্রজাপতি চুমু খেতে যায় ঘাসফুলের ঠোঁটে, পাড়ার ন্যাংটো হরিণ তার জামা কেড়ে নিতে দৌড়ে আসে, দেখে প্রজাপতি লুকোয় রাঁধাচূড়া মাসির শাড়ির আঁচলে, ঘাসফুল ভেজা ঠোঁটে অপেক্ষা করে আরেকটি চুমুর।

তুমি নেই বলেই কী ইচ্ছেরা জড়ো হচ্ছে এমন . . .

রাস্তার ছেলে আর কবি

এ গল্প আগেই করেছি, ওই যে ছোটবেলায় একদিন নদীর ধারে হাঁটছিলাম
আর ধা করে উড়ে এসে এক রাস্তার ছেলে আমার স্তন টিপে
দৌড়ে পালিয়ে গেল, অপমানে নীল হয়ে বাড়ি ফিরে সারারাত কেঁদেছিলাম!

এ গল্প এখনও করিনি যে বড় হয়ে, কবিতা লিখতে শুরু করে
কবিদের আড্ডায় যেই না বসি,
হাতির মত কবিরা স্তন টিপে দিয়ে চলে যায়।
পরদিন দেখা হলে বলে *কাল খুব মদ পড়েছিল পেটে*
মদের দোহাই দিয়ে কবিরা বাঁচে,
কবিতার দোহাই দিয়েও পার পায় বটে।

প্রায়শ্চিত্য

একটি অসুখ চাইছি আমি, ঠিক সেই অসুখটি --
সেই বৃহদন্ত্রের অসুখ, হামাগুড়ি দিয়ে যকৃতে পৌঁছবে,
যকৃত থেকে হেঁটে হেঁটে হাড়ে, হাড় থেকে দৌড়ে ধরবে ফুসফুস
ফুসফুস পেরিয়ে রক্তনদী সাঁতরে মস্তিস্ক।
ভুল কাঁটাছেঁড়া, ভুল ওষুধ, ভুল রক্তের চালান
অসুখের পেশিতে শক্তির যোগান দেবে, কুরুক্ষেত্রে বাড়তি সৈন্য, রণতরী।
সেরকম পড়ে থাকব বিষন্ন বিছানায় একা, যেরকম ছিলে তুমি
যেরকম আস্ত কঙ্কাল, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া হাড়ের কঙ্কাল
মাংস খসে পড়ছে, রক্ত ঝরে যাচ্ছে
ধ্বসে পড়ছে স্নায়ুর ঘরবারান্দা

ঠিক সেরকম হোক আমারও,
আমারও যেন চোখের তারা জম্মের মত অচল হয়
যেন তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়, ফুসফস
ফুলে ঢোল হয়ে থাকে জলে, নিঃশ্বাসের হাওয়া পেতে যেন কাতরাই,
যেন হাত পা ছুঁড়ি,
যেন না পাই।
যেন কারও স্পর্শ পেতে আকুল হই,
যেন কাতরাই, হাত বাড়াই,
যেন না পাই।